ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/014

আধুনিক যুগে বাঙালির দর্শনচিন্তায় মানবতাবাদ

তাপসী রাবেয়া*

Abstract: Humanism holds a prominent position in modern Bengali meditation and philosophy trends. The impact of the European Renaissance significantly influenced the intellectuals of Bengal. Consequently, Bengalees have moved away from conventional perceptions of life and the world, fostering a culture of innovative thinking and imagination. They developed innovative abilities, cultivated a deep love for their country and culture, and, most importantly, learned to respect themselves. Influential religious and social reformers like Rammohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Akshay Kumar Dutta, and Keshub Chandra Sen laid the foundations of Bengali humanism in the early 19th century. After that, Young Bengal members' rational, progressive, non-communal thinking and utilitarian ideology shaped Bengal's holistic humanist philosophy. Sri Ramkrishna's famous quote, "Yatra Jiva Tatra Shiva," exemplifies his humanistic beliefs, reflecting the broader humanist tradition within Bengali thought. Similarly, humanism was central to Vivekananda's philosophical and meditative practices. This article delves into the work of famous Bengali thinkers who have promoted humanism in modern times.

মুখ্যশব্দ: মানবতাবাদ, রেনেসাঁ, বস্তুবাদ, নৈতিকতা, আত্মশক্তি

ভূমিকা

মানুষের একত্ব, অখণ্ডত্ব, সাম্যের ধারণা তথা মানবপ্রেমই মানবতাবাদের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। এটা এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষের মর্যাদা, কল্যাণ এবং ক্রিয়াকর্মের প্রতি

* প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আস্থাশীল। মানবতাবাদ মানুষের মর্যাদার উপর গুরুত্ব দিয়ে মানুষের স্বাধীন সত্তাকে স্বীকার করে কেবল মানুষের মহিমাই ব্যক্ত করে না, বরং একই সাথে মানবকল্যাণের আদর্শের কথা প্রচার করে। সুতরাং মানবতাবাদ হলো এমন একটি দার্শনিক ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষের মঙ্গল ও অগ্রগতির ধারণাকে বেগবান করার লক্ষ্যে মানবজীবনের যাবতীয় বিষয়ের বিবেচনায় মানুষকেই কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে।

দর্শন, ধর্ম, নৈতিকতা এবং রাজনীতিতেও মানবতাবাদ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। এই শব্দটি সমষ্টিগত মিলনের জন্য ব্যক্তিমানুষের সংকীর্ণ স্বার্থকে ত্যাগ করতেই আমরা ব্যবহার করি। মানবসত্তার প্রতি উদার ও মঙ্গলকামী হওয়াই মানবতাবাদের মূল লক্ষ্য। মানবতাবাদ প্রকৃতপক্ষে একটা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এটা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্যায়ন করে, মানুষের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে। সর্বোপরি মানবিকবোধসম্পন্ন হওয়ার কথা বলে। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে সক্রেটিস, প্লেটো, কান্ট, হেগেল, মিল প্রমুখ দার্শনিক ধর্ম, নৈতিকতা ও দর্শনের সূত্রে গ্রোথিত মানবতাবাদের প্রচার করেছেন। অগাস্ট কোঁতের ধর্মীয় মানবতাবাদ পাশ্চাত্য দর্শনে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিশ শতকে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সার্ত্র অস্তিত্ববাদের আবরণে মানবতাবাদের বিকাশ ঘটান। বাঙালির দর্শনে অধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রভাব থাকলেও মানবতাবাদের প্রভাবই বেশি। জাতি হিসেবে বাঙালি সংকর বলে প্রাচীন যুগের বাংলা থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন দর্শন ও চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বাঙালির দর্শন। বিভিন্ন গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালির মননসাধনা যুগের প্রেক্ষাপটে বিকশিত হয়েছে। ফলে বাংলায় পরিচিতি লাভ করে অস্তিত্ববাদ, প্রয়োগবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, মার্কসবাদ, বিশ্লেষণী দর্শন ও মানবতাবাদের মতো বিভিন্ন মতবাদ।

বাঙালির মননসাধনায় মানব ভাবনা ও প্রেমদর্শনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে বাঙালির নবজাগরণের মধ্য দিয়ে। নবজাগরণ কোনো দেশে বা সমাজে কোনো কালে হঠাৎ কোনো মনীষী দ্বারা জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন প্রাণনার উদ্বোধন লক্ষ করা যায়, তখন সে দেশের বা সে সমাজের, সে কালের মানুষের জাতীয় জীবনে সুসংগঠিত ভাব-বিপ্লবকে আমরা নবজাগরণ বলে আখ্যাত করে থাকি। তাই বলা যায়, জীবন ও জগৎ-জিজ্ঞাসা, অমিত কৌতূহল, সন্ধিৎসা, নির্মিৎসা, উপচিকীর্ষা, শ্রেয়োচেতনা, মর্ত্য-প্রীতি, জীবনানুরাগ আর রূপতৃষ্ণা বা সৌন্দর্য চেতনা প্রভৃতির সামূহিক ও সামষ্টিক অভিব্যক্তিই হচ্ছে নবজাগরণ বা রেনেসাঁস (মতিউর, ২০১২, পৃ. ২০৬)।

নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে একটি সমাজ বা দেশের মানুষের জীবনধারা, জগৎ-জীবন সম্পর্কে সেকেলে ধ্যান-ধারণা পরিহার করে নতুন করে ভাবতে শেখায়, আত্মশক্তিকে জাগ্রত করার মাধ্যমে প্রত্যয়ী করে তোলে। প্রতীচ্যের ইতিহাস, সংস্কৃতি, চিন্তা-মনন, দর্শন বাংলার নবজাগরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিল। প্রতীচ্যের প্রসিদ্ধ দার্শনিকের মধ্যে বিশেষ করে অগাস্ট কোঁত, বেন্থাম, মিল, রুশো, হবস, লক এবং এডাম স্মিথ দার্শনিকের দর্শন দ্বারা উনিশ শতকের বাঙালি চিন্তাবিদেরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাঙলার নবজাগরণে যেসব দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তাছাড়া বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসে আরো অসংখ্য মানবতাবাদী দার্শনিকের ভূমিকা আছে। তবে বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন দার্শনিকের মানবতাবাদ নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং তাঁদের মানবতাবাদী দর্শনের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব। যেসব মানবতাবাদী দার্শনিক প্রত্যক্ষভাবে মানুষ ও সমাজ নিয়ে কাজ করেছেন, মানবের মুক্তির কথা বলেছেন, আত্মশক্তির জয়গান করেছেন, মানবমুক্তির ক্ষেত্রে দর্শনচর্চা করেছেন এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন তাঁদের দর্শনকেই আলোচ্য প্রবন্ধে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

মানবতাবাদ

বর্তমানে বহুল প্রচলিত শব্দ মানবতাবাদের ইতিহাস বেশ পুরনো। মানবতাবাদ মূলত মানবকেন্দ্রিক দার্শনিক আন্দোলন, যা ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে মানবদয়াকেই পরমকল্যাণ হিসেবে গ্রহণ করে। এর চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে মানব প্রজ্ঞা, নৈতিকতা এবং ন্যায়পরায়ণতা। মানবতাবাদ এমন এক মতবাদ, যা মানুষকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাঁর ভেতরে আত্মশক্তিকে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সমস্ত ভয় দূর করে। সর্বোপরি মানুষ যে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে লুক্কায়িত বৃহৎ শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের কথা বলে।

দার্শনিক অনুধ্যান ও আলাপ-আলোচনাকে বাস্তবমুখী ও কার্যকর করে তুলে সোফিস্টরাই সম্ভবত প্রথম মানবতাবাদের পতাকা উত্তোলন করেন। প্রতীচ্য দর্শনে তারাই প্রথমবারের মতো প্রশ্ন তুললেন এ বিশ্বে মানুষের স্থান কী? মানুষ সম্পর্কে তাঁদের এ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে মানবতাবাদী চিন্তার প্রতিফলন ঘটে (Thilly, 1914, P. 49)। সোফিস্ট দার্শনিকেরা দর্শন সম্পর্কে

পরম্পরাগত ধারণার অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়ে মানবতাবাদী দর্শনের প্রথম প্রচার ঘটান। যেখানে পূর্বের দার্শনিকেরা দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বস্তুজগতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সেখানে সোফিস্টরা বলেন—"জগৎ নয়, মানুষ নিজেই তার আলোচনা ও অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য ও উপজীব্য।" এভাবে তাঁরা দর্শনের ইতিহাসে এমন এক গতিশীল ও প্রাণবন্ত মানবতাবাদের সূচনা করেন, যার ফলে দার্শনিক চিন্তায় উন্মোচিত হয় এক নতুন দিগন্ত (আমিনুল, ১৯৯৬, পৃ. ৬৪)।

সোফিস্টদের মধ্যে অন্যতম প্রোটাগোরাস মনে করেন, ব্যক্তি নিজেই সবকিছুর পরিমাপক। আমার কাছে যখন যা সত্য বলে মনে হবে তাই আমার জন্য সত্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্রভাবে তাঁর নিজের বিচারালয়ের চূড়ান্ত বিচারক। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হলো "Man is the measure of all things; of what is, that it is! of what is not, that is not." (Stace, 1972, p. 112) । দার্শনিক প্রোটাগোরাস মানবতাবাদী দর্শনের আলোচনার মধ্য দিয়ে বিখ্যাত হয়ে আছেন। পুরো সোফিস্ট সম্প্রদায়ের মানবতাবাদী দর্শনের প্রকৃতি নয় বরং মানুষ নিজেই তার চিন্তার প্রথম ও প্রধান সমস্যা।

সক্রেটিসের দার্শনিক চিন্তার মূল বিষয় ছিলো মানবজীবনের উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের করণীয় বিষয় এবং মানবজীবনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। তিনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেন। এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তি "Know Thyself" । তিনি বিশ্বাস করেন, নির্বিচারে বিশ্বাস ও কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম হলো জ্ঞান। আত্মজ্ঞান অর্জন বা নিজেকে জানাই মানুষের পরম কাম্য হওয়া উচিত। তাঁর মতে, আমাদের কী করা উচিত এবং কীভাবে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা যায় এসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ কারণেই সক্রেটিস আত্মজ্ঞানের মহান ব্রতে এবং মানবকল্যাণে নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এরিস্টটলের মধ্যেও মানবতার প্রতিফলন দেখা যায়।

আধুনিক যুগের দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন, জন লক এবং থমাস পেইনের বিভিন্ন রচনায় মানবপ্রেমের আলোচনা পাওয়া যায়। তাছাড়া জেরেমি বেন্থাম ও জে.এস. মিলের উপযোগবাদ এবং অগাস্ট কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ এসব মতবাদের মধ্য দিয়ে মানবতাবাদের সুরই বেজে ওঠে। ফরাসি দার্শনিক রুশোর মানবতাবাদী চিন্তাচেতনা সমগ্র ইউরোপের চিন্তাজগতে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। মানবসমাজের অবর্ণনীয় দুঃখ দূর করার জন্য তাঁর *Social Contract* গ্রন্থে মানুষকে সব রকমের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শৃঙ্খল ভঙ্গ করার কথা বলেছেন। কার্ল মার্কস তাঁর

গ্রন্থ *Das Capital* এ প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন সাধন করে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ শতকে অস্তিত্ববাদের মতো জীবনমুখী দর্শনের অন্যতম দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্রও মানবতাবাদের জয়গান করেছেন। অস্তিত্ববাদ মানবতাবাদী দর্শন, মানবিক, বাস্তববাদী ও জীবনমুখী হিসেবে স্থান পেয়েছে কিয়ার্কেগার্ড এর চিন্তা-চেতনায়। বিংশ শতাব্দীর শান্তিবাদী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের চিন্তায়ও মানবতাবাদের সন্ধান মিলে। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবতার কল্যাণেই একটি বিশ্বসরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

কোঁত, বেন্থাম, মিল, রুশো প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মানবকল্যাণমূলক চিন্তাধারা প্রাচ্যের দর্শনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তবে প্রাচ্যে মানবতাবাদী দর্শন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের হাত ধরে। তিনি জগতের সকল প্রাণীর সুখ কামনা করে জাগতিক দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলেন। তিনি মানুষকে অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে মুক্তবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন সেই সাথে মানবতাবাদের মূল বিষয় মানুষের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করার প্রতি আহ্বান জনিয়েছেন। সারাবিশ্বে মুক্তিকামী মানুষের এক উজ্জ্বল প্রেরণা হলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর মানবতাবাদী দর্শনের মূলে ছিল অহিংসা, সাম্য ও স্বাধীনতা।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে মানবকল্যাণব্রতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ডিরোজিও। তিনি বাঙালি তরুণদের মানসিক চিন্তায় মুক্তবুদ্ধির অনুশীলন করতে আগ্রহী করেছেন। মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও প্রসার ঘটিয়ে তৎকালীন বাঙালি সমাজকে ধর্মাচ্ছন্নতা, অধঃপতন থেকে মুক্ত করে উন্নতি সাধন করাই ছিল তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। এই শতাব্দীর আরেক মনীষী রামমোহনের বিভিন্ন রচনায় মানবতাবাদী ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। তিনি একটি সমুন্নত উদার ধর্মবোধকে আশ্রয় করে সকল মত ও সকল পথকে সমান শ্রদ্ধা দেখিয়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান সকলকে সমভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এ গভীর ধর্মবোধই তাঁকে বিশ্বপ্রসারিত মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হন অবহেলিত নারী সমাজকে মুক্তি দিতে। তিনি নারীশিক্ষা প্রচলন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন করেছেন। সার্বিক মানবকল্যাণের লক্ষ্যে অবক্ষয়প্রাপ্ত ঘূণে ধরা সমাজকে বাস্তবতার আলোকে পরিবর্তন করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

উনিশ শতক ছিল নবজাগরণের অধ্যায়, এ সময় অনেক মানবপ্রেমিকের জন্ম হয়। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র প্রমুখ অন্যতম। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের যে মূলমন্ত্র প্রচার করেন সেখানে তাঁর মানবতাবাদের সন্ধান মেলে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে সৎকর্ম ও নৈতিক মূল্যের উপর গুরুত্ব দেন। অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তার মূল বিষয় ছিল মানুষ। তিনি ইহজাগতিক মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে মানুষের জাগতিক কল্যাণ কামনা করেছেন। তিনি মনে করেন সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের মধ্য দিয়েই মানবতার পূর্ণতা পায়। বাস্তববোধসম্পন্ন ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে বাঙালি নবজাগরণে অক্ষয়কুমার দত্ত এক নতুন চেতনা যোগ করেন। এভাবে কেশবচন্দ্র সেনও সাম্যভিত্তিক ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ধর্মের পাশাপাশি সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজ নামে এক নতুন সমাজ গঠন করে সমাজ বিপ্লবের ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁর ব্রাহ্মসমাজে সকল ধর্মমতকে স্থান দেয়ায় এ ধর্ম বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। তাঁর সমন্বিত ধর্মমতের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানবতার কল্যাণ সাধন করে সমাজকে প্রগতির দিকে ধাবমান রাখা।

মানবপ্রীতি ও মানবমৈত্রীর শিক্ষা বঙ্কিম-সাহিত্যেও লক্ষ করা যায়। দেশ ও জাতিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। মনুষ্যত্ববোধকে আশ্রয় করেই তাঁর দর্শন প্রচারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় ও সাহিত্যকর্মে মানবতাবাদের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সীমা ও অসীমের মাঝে এক সেতুবন্ধন তৈরি করে ক্ষুদ্রজীবনকে বিশ্বজীবনের সাথে মিলিত করার এক আকুতি তাঁর সমগ্র রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। মনুষ্যত্বের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ, এই শ্রদ্ধাবোধ তাকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বমানবের দিকে প্রসারিত করেছে। তাঁর আলোচনার প্রধান বিষয় মানুষ এবং তিনি মনুষ্যত্বের জয়গান করেছেন। আরও এমন বাঙালি সাহিত্যপ্রেমীদের লেখায় মানবতাবাদের চিত্র ফুটে ওঠে। মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের লেখায় মানবমুখী চিন্তা-চেতনা দেখা যায় এবং সকল ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে তাঁদের সাধনায় মানুষকে স্থান দিয়েছেন। এছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিভিন্ন গান ও কবিতায় আর্তমানবতার সেবায় তথা দীনহীন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার যে আত্যন্তিক আগ্রহ দেখা যায় তা সাম্য ও মানবতাবাদের পরিচয় বহন করে।

মানুষের মুক্ত বুদ্ধি ও বিচারমূলক চিন্তনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এক অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী কবি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, তাঁর দর্শনের মূল বিষয় ছিল মানুষের কল্যাণ। তিনি সকল প্রকার কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা এবং শোষণের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গল্প, কবিতা, উপন্যাসের কোথাও ধর্মীয় সংকীর্ণতা, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। মানুষের মর্যাদা ও দায়িত্ববোধকে সবার উপরে স্থান দিয়ে তিনি নারীপুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মানবতাবাদ রচিত হয়েছে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও মেহনতি মানুষের পক্ষে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে মার্কসবাদের বিকাশ ঘটে এবং মানবেন্দ্রনাথ রায় এ মত দ্বারা প্রভাবিত হন। যদিও পরর্তীকালে তিনি নব্য মানবতাবাদী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেন। তাছাড়া বাংলাদেশে সমন্বয়বাদী মানবতাবাদের প্রধান প্রচারক হলেন গোবিন্দচন্দ্র দেব। মূলত তিনি ভাববাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়ে যে সমন্বয়ী ভাববাদের গোড়াপত্তন করেন তার মূলে ছিল মানুষ। সকল মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের কল্যাণের মাধ্যমে কীভাবে বিশ্বমানব কল্যাণমূলক দর্শন গড়া যায় সেটাই ছিল তাঁর দর্শন তথা সমন্বয়ী ভাববাদের মূল লক্ষ্য। এছাড়াও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আরজ আলী মাতুব্বর, আবুল হাশিম, প্রবোধ চন্দ্র সেনের মতো চিন্তাবিদদের চিন্তাধারায় মানবতাবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

আধুনিক যুগের বাংলায় মানবতাবাদী গতিধারা

আধুনিক কালের বাংলা, দর্শন ও সাহিত্যে পাশ্চাত্যের নিরীশ্বরবাদী ও আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের অনেক ভূমিকা রয়েছে। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনা ও দর্শনচর্চা বাঙালির মনন ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তা পাশ্চাত্যের নবজাগরণ বা রেনেসাঁর মতো মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ ছিল। এ সময়ে বাঙালিরা সমগ্র উপমহাদেশের সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের জন্য অবদান রাখে। অর্থাৎ সমাজের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়, যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার প্রকাশ ঘটে। এর ফলে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এই আলোড়ন বাংলার নবজাগরণ বা বেঙ্গল রেনেসাঁ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। রেনেসাঁর এসব চিন্তাবিদ ও দার্শনিকেরা ইউরোপীয় চিন্তা, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং মানবতাবাদের আদর্শে নিজেদের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিকে নতুন করে

রূপায়ণ করার চেষ্টায় নিয়োজিত রাখেন। বঙ্গীয় রেনেসাঁয় ডিরোজিও ও তাঁর অনুসারীরা ছাড়া অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নিরীশ্বরবাদী চিন্তাবিদের সংখ্যা ছিল কম। অন্যদিকে, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী ধর্মের মধ্য থেকেই ধর্মের নতুন মূল্যায়ন ও ধর্মের সাহায্যেই সমাজের অকল্যাণকর বিষয়গুলো সংস্কারে প্রয়াসী হন। তাঁদের চিন্তা-ভাবনার মুখ্য উপাদান ছিল মানুষ, তাঁরা যে ধর্ম চিন্তা করতেন সেটা যতটা না আনুষ্ঠানিক তার চেয়ে বেশি ছিল আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক (সৌরেন্দ্রমোহন, ১৯৯১, পৃ. ২)।

বাঙালির মানসপটে রেনেসাঁপর্বে একুট দেরিতে হলেও পরবর্তীকালে এটি পুরো ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। অবিভক্ত বাংলায় ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের এই আন্দোলন বঙ্গীয় রেনেসাঁ হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। এই আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত অর্থাৎ বঙ্গীয় রেনেসাঁপর্বে রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) সময় থেকে শুরু হয়। রামমোহন ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, শ্রী অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ দার্শনিক রেনেসাঁর ধারক ও বাহক ছিলেন। তারও পরবর্তীকালে আরজ আলী মাতুব্বর, সাইদুর রহমান, আবুল হাশিম, জি.সি দেব প্রমুখ চিন্তাবিদ পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা ছিল।

এই বঙ্গীয় রেনেসাঁপর্বে চিন্তা ও বৌদ্ধিক জগতে এক বিপ্লব সাধন করেছিল। তবে ধর্মকে সামনে রেখে এসব চিন্তাবিদেরা মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছিল। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মকে অস্বীকার না করেও এবং ধর্মের শাশ্বত বাণী ও মানবিক দিকটি তুলে ধরে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারপূর্ণ সমাজ সংস্কারে অবদান রেখে রেনেসাঁর উদ্যোম ও শক্তিকে জাগ্রত করেছেন এবং মানবতাবাদী দর্শন গড়ে তুলেছেন। সাম্যবাদী কাজী নজরুল ইসলামও ধর্মের অবদানকে স্বীকার করে গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং বাঙালির নবজাগরণে তৎকালীন সমাজে যেসব অমানবিক প্রথা প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে বৌদ্ধিক ও আইনসম্মত আন্দোলনের মাধ্যমে যে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তা আসলে মানবতাবাদকেই ধারণ করে।

আধুনিক যুগের বাংলায় মানবতাবাদী দার্শনিক

আধুনিক যুগে বাঙালির দর্শনচিন্তায় মানব ও মানবতাবাদ বেশ গুরুত্ব পায়। এ যুগেই রেনেসাঁর প্রভাবে বাঙালির চিন্তা-চেতনায় এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। বাঙালি দার্শনিকেরা অন্ধ বিশ্বাস,

কুসংস্কার মুক্ত হয়ে মানবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়। স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তায় উদ্ভাসিত হয়ে বাঙালি দার্শনিকেরা আধুনিক যুগে দর্শনচর্চায় এগিয়ে আসে। যাঁদের দর্শনে মুক্ত চিন্তা, স্বাধীনতা, মানবতা, সমাজ ইত্যাদি পাওয়া যায় তাঁদের মানবতাবাদী দর্শনের আলোচনা করব।

রাজা রামমোহন রায় (১৮১৫-১৮৩০) বাঙালির চিন্তা চেতনায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারের মধ্য দিয়ে নবযুগের সূচনা ঘটিয়েছিলেন। তিনি সাম্যাদর্শের মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে বাঙালিদেরকে প্রচলিত প্রথার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আত্ম-প্রত্যয়ে বলীয়ান করতে চেয়েছেন। তিনি জড়তা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিদ্রোহে মনন ও বিচার-বুদ্ধিকে অস্ত্র হিসেবে নিয়েছিলেন। তাঁর মানবকেন্দ্রিক দর্শন ভাবনার মধ্য দিয়ে প্রতীচ্যের মানুষ পেয়েছিলো জ্ঞানের পথ, স্বাধীনতার পথ সর্বোপরি আত্মশক্তিকে জাগ্রত করার পথ।

রামমোহন রায়ের দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল মানুষ। তাঁর সকল সংস্কারের মূলে মানবতা এবং মানবপ্রেমের জয়গান ছিল। তাঁর ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে তিনি নতুন নতুন মুক্তির পথের সন্ধান করেছেন। প্রচলিত কুসংস্কার ও ভ্রান্তবিশ্বাসের অভিশাপ থেকে ধর্মকে তিনি মুক্ত করেছিলেন। প্রবল বিরোধিতার প্রাচীর উপেক্ষা করে তিনি যুগ-প্রাচীন নির্মম ও নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করেছিলেন। তাছাড়া, জাতিভেদ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, পণপ্রথা, বহুবিবাহ প্রভৃতি যেগুলি মানুষকে পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাদের মূলোৎপাটন করে তিনি মানবতাবাদের পতাকাকে সবকিছুর উপরে তুলে ধরেছিলেন। মানবতাবাদের এই মূলমন্ত্র তিনি লাভ করেছিলেন এক অকপট ধর্মবোধ থেকে, যা তাঁর অন্তরলোকে চিরজাগ্রত থেকে তাঁকে নিরন্তর মানুষের কল্যাণ কামনায় বাধ্য করেছে। (Collet, 1962, p. 209)।

তিনি একজন বাস্তববাদী দার্শনিক। মূলত ১৮১৫ সালে স্থাপন করা 'আত্মীয় সভা'-র মাধ্যমেই তিনি সমাজ সংস্কারে আগ্রহী হন। রামমোহন রায় বুঝতে পেরেছিলেন, তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভারতবাসীর মঙ্গলের স্বার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং এর ফলে সতীদাহের মতো অমানবিক প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ মূলত তাঁর মানবতাবাদী চিন্তারই ফসল। রামমোহন ভারতের স্বাধীনতা তথা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ইংরেজদের সংস্পর্শে থেকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ খানও এই একই নীতি ও পক্ষ অনুসরণ করেছিলেন। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আনয়ন করেন, এর মধ্যে

অন্যতম একটা অভিযোগ হলো হিন্দুধর্মের বিনাশকারী। এর উত্তরে তিনি বলেন, "কোন দিনই আমি হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিনি। আমার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল কুসংস্কার ও গোঁড়ামি।" (তেসলিম, ২০১১, পৃ. ৮২)।

রামমোহন মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই ধর্মসংস্কারে অগ্রসর হোন। জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ অতিক্রম করে এবং মানবগোষ্ঠীর সংকীর্ণতা পরিহার করে ধর্মসাধনার মাধ্যমে তিনি এক বৃহৎ সমন্বয়ের চেতনা গড়ে তুলেছিলেন। দেশ, কাল, সংস্কার, রুচি, আচার-অনুষ্ঠানাদির শত বিভিন্নতায় জাতিসমূহ কীভাবে বা কোন পথে মিলিত হতে পারে, ধর্মসাধনায় তিনি এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছিলেন। তাই তাঁর ধর্মসাধনার মূলে আমরা একটি সুসংহত জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই (মতিউর, ২০১২, পৃ. ২১৬)।

রামমোহন তাঁর এই অকপট ধর্মবোধ থেকে তিনি একদিকে যেমন লাভ করেছিলেন অপরিসীম ঈশ্বরভক্তি, অন্যদিকে অর্জন করেছিলেন সুগভীর মানবপ্রেম। শিবজ্ঞানে জীবনসেবার বৈদান্তিক ঐতিহ্যই তাঁকে সমগ্র বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পৃথিবীর প্রতিটি জীবন্ত ও আস্তিক ধর্মেই তাঁর আস্থা ছিল। বেদ-বেদান্ত-কুরআন-বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের সার্থক অনুশীলন থেকে তিনি এই মহান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সকল ধর্মের মূলনীতিই এক ও অভিন্ন (Seal, 1912, p. 18)।

মূলত তিনি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে হিন্দু ধর্মকে বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে যুগোপযোগী হিসেবে গড়তে চেয়েছেন। এর পিছনে মানবকল্যাণই ছিল মুখ্য বিষয়। আর, এজন্য রামমোহনকে ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে পরিগণিত করা হয়। তিনি সতীদাহ প্রথা বিলোপ ছাড়াও সমাজে নারীদের মুক্তির জন্য বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাবিক্রয় এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি একেশ্বরবাদী ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। মূলত এই ধারণার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানবতাবাদ। তিনি ধর্মকে দেখেছেন মানবমুক্তির উপায় হিসেবে, ধর্মে যে প্রেম ও মানবতার কথা বলা হয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। ধর্মজগতে রামমোহন বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে সর্বজনীন মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্যের ঐক্যের নির্দেশ করে ধর্মক্ষেত্রে সাম্যভিত্তিক একটা সমন্বয় বিধান করার চেষ্টা

করেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর এই সাম্যভিত্তিক সমন্বয়ের একটি সামাজিক তাৎপর্য স্বীকার্য (শম্ভুনাথ, বা. ১৪০০, পৃপৃ. ৬৭-৬৮) ।

ধর্মের আচার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে মানুষকে স্থায়ী কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল রামমোহনের সারা জীবনের সাধনা। ধর্মের শিক্ষায় যে মানবিকতাবোধের তাগিদ রয়েছে সেটা তিনি যুক্তি দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর এই ধর্মনিঃসৃত মানবিকবোধই পরবর্তীকালে স্পষ্ট ও ব্যাপক রূপ লাভ করে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মতো মানবতাবাদী বাঙালি দার্শনিকের চিন্তা, চেতনা ও মননে। বাঙালির নবজাগরণের যুগস্রষ্টা রাজা রামমোহনের পরে মানবতাবাদী চিন্তধারা বিকাশে যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য এবং বাঙালির নবজাগরণে আমূল পরিবর্তনবাদী ধারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরা ইয়ং বেঙ্গল বলে পরিচিত (আমিনুল, ২০০২, পৃপৃ. ১১৬)।

ইয়ং বেঙ্গলের দার্শনিকেরা প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন এবং আধুনিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিলেন তবে তাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের প্রভাব ছিল এবং তাঁরা পাশ্চাত্যের রীতিকে অন্ধ বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করতেন। তবে মুক্তচিন্তার আলোকেই পাশ্চাত্যের মানবতাবাদকে বিচার করা হয়েছে। ইয়ং বেঙ্গলের চিন্তাবিদেরাও তাঁদের যুক্তি দিয়ে সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার থেকে তৎকালীন হিন্দুসমাজ তথা মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তাঁদের দর্শন ছিল মানবতার দর্শন। রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজ তথা ব্রাহ্মধর্মের ধারক হিসেবে মানবতাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৮৯০)। রামমোহন রায়ের মতো তিনিও ছিলেন একজন যুগ-সারথি। রামমোহন যা ধ্যানে দেখেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাকেই আপন উপলব্ধিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনকে তাই অনেকেই রামমোহনের জীবনদর্শনের এক সফল ভাষ্য বলে আখ্যাত করেছেন। চিন্তা-চেতনায় দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রামমোহনের খুবই কাছাকাছি। কথিত আছে, দেবেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্প কিছুদিন পরই শিশুকে দেখে না-কি রামমোহন বলেছিলেন, "এই শিশু আমার স্থান অধিকার করিবে।" (মণি, ১৯৬০, পৃ. ৩)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্মবাদের ভিত্তি ছিল ঈশ্বরভক্তি। কিন্তু রামমোহন রায়ের অধ্যাত্মবোধের মূল কথা হলো মানবপ্রেম। দেবেন্দ্রনাথ বাস্তবজীবনের মধ্যেই ব্রহ্মকে অনুভব করার কথা বলে ধর্মজগতে এক বিপ্লব সাধন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভক্তিপথের পথিক। তাই রামমোহনের পর বাঙালির নবজাগরণের

ইতিহাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক, দ্বিতীয় সৃজনী শক্তি (মতিউর, ২০১২, পৃ. ২৩৪)।

দেবেন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনা প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি '*তত্ত্বরঞ্জনী সভা*' স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ১৮৩৯ সালে এ সভার নামকরণ করা হয় '*তত্ত্ববোধিনী সভা*'। '*তত্ত্ববোধিনী সভা*' বাংলার মানবতাবাদী চিন্তার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৮৪৩ সালে '*তত্ত্ববোধিনী সভা*'র মুখপাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বের হয়। এ পত্রিকায় তৎকালীন বহু বাঙালি চিন্তাবিদ বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতেন। ব্রাহ্মধর্মকে সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু প্রচেষ্টা চালান। কেননা, ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদ এবং ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর অবিচল আস্থা এক ধরনের ধর্মীয় সাম্যবোধের অনুভূতি জাগায় যা তাঁকে মানবতাবাদের দিকে উদ্বুদ্ধ করে।

দেবেন্দ্রনাথ '*তত্ত্ববোধিনী সভা*'র মাধ্যমেই ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার স্ফুরণ ঘটান। মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষায় তিনি এই সভাকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাই এটি তাঁর সমগ্র কর্মজীবনের এক বড় অধ্যায়। তিনি সকল পৌত্তলিকতা বর্জন করে সংঘবদ্ধভাবে হিন্দুধর্মের প্রচার ঘটান। তিনি তাঁর রচিত আত্মজীবনীতে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে বলেন: "এর উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম, বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্তে আমাদের আস্থা ছিল না (দেবেন্দ্রনাথ, ১৯৬২, পৃ. ২৬)। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে সর্বজনীন ধর্মে পরিণত করার উদ্দেশ্যে মানুষে-মানুষে পার্থক্য মুছে ফেলতে চেয়েছেন। তিনি ধর্মীয় সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অখণ্ড মানবতাবাদের স্বপ্ন লালন করেছিলেন।

বাঙালির নবজাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক চিন্তাবিদ হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। তাঁর দর্শনচিন্তার মূল উপজীব্য বিষয় ছিল মানুষ এবং তিনি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে জাগতিক কল্যাণ করতে চেয়েছেন। উনিশ শতকে উপযোগবাদী চিন্তা ইংল্যান্ডে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশে এই চিন্তার ব্যাপক অনুশীলন দেখা যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত পাশ্চাত্যের উপযোগবাদী মতবাদ, বিশেষ করে জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। উপযোগবাদীদের মতে, 'সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ কামনাই নৈতিক আদর্শ।' আর সুখের মানদণ্ড জীবনের সার্থকতা ও

সফলতা দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সুখ কামনা করে। বাংলায় উপযোগবাদী চিন্তার প্রভাব সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন বলেন, "The Politics of the age is Benthamism, its ethics Utilitarianism, its religion Rationalism, its philosophy Positivism." (Basu, 1940, p. 106)

বাঙালির মননসাধনায় অক্ষয়কুমার দত্ত এক বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক ছিলেন। তিনি দর্শনে বেদ-বেদান্তের প্রচলিত ধারার পরিবর্তে প্রকৃতিবাদী ধারা যোগ করেছেন। তিনি মানবিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতিও আকৃষ্ট ছিলেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সকল কুসংস্কার ভেঙে তিনি বাঙালি জাতিকে মুক্তি প্রদানের দীক্ষামন্ত্র দিয়েছিলেন। তিনি মনে প্রাণে একজন মানবপ্রেমিক দার্শনিক। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কর্মের মূল লক্ষ্যই ছিল জীবসেবা। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে নিজস্ব পরিকল্পনায় ব্রাহ্মধর্মকে যুক্তিবহ ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে চেয়েছিলেন মানবকল্যাণের ব্রত নিয়ে মানুষকে ভাবতে গিয়ে মানুষের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় তিনি ধর্মসমীক্ষায় হাত দেন। তাঁর রচিত *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* গ্রন্থটির প্রথম ভাগের মূল বিষয়বস্তু মানুষ। পূর্বাভাস থেকে উপসংহার পর্যন্ত সর্বত্রই অক্ষয় দত্ত মানুষের স্বরূপ অন্বেষায় শ্রম নিয়োগ করেছেন। গ্রন্থটির প্রথম ভাগ মানুষের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম আলোচনা করে, মানুষের সুখ ও কল্যাণ কিসে হয়, সে সম্পর্কে লেখক কতকগুলি নিয়ম স্থির করেছেন (নবেন্দু, ১৯৭১, পৃ. ৯২)। তিনি মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মানুষের স্বরূপ অনুসন্ধান করে লিখেছেন:

> ইতর জন্তু ও মনুষ্য নিয়েই পৃথিবীর প্রাণীজগৎ। মনুষ্য এই ভূলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু ইতর জন্তু ও মনুষ্য নিজ নিজ স্বভাবে কাজ করে। পরস্পর তবু সুখে, দুঃখে নির্ভরশীল। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী ও বস্তু সমুদয়ের পরস্পর যত সম্বন্ধ আছে, জগতের তত নিয়ম আছে। ভৌতিক নিয়ম, শারীরিক নিয়ম, মানসিক নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়ম এক্ষেত্রে পালনীয়। নিয়ম লঙ্ঘনই দুঃখের কারণ। পরমেশ্বর সমস্ত দুঃখই সংসারের হিতাভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন। নিয়ম পালন করার জন্যই দুঃখের ব্যবস্থা। সমুদয় কৌশলই মঙ্গল কৌশল (অক্ষয়কুমার, ১৮৫১, পৃ. ১৩৯)।

বেন্থামের হিতবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তার প্রভাব অক্ষয়কুমারের মধ্যে লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ই হিতবাদী চিন্তধারার বিকাশ সাধন করেন। তবে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য ছিল। অক্ষয়কুমার হিতবাদকে

দেখতেন ব্যক্তিমানুষের বিকাশের দিক থেকে। আর বঙ্কিমচন্দ্র দেখতেন ব্যক্তিমানুষের সমষ্টিগত উন্নতির দিক থেকে (সৌরেন্দ্রমোহন, ১৯৯০, পৃ. ৪৮) । অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে তাঁর লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছেন, আর অক্ষয়কুমার দত্তের লক্ষ্যের মূলে ছিল মানুষ। তবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত মানুষকে বিশ্লেষণ করেননি, বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বন করে জীবন ও সমাজের মধ্যে এক সুগভীর সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষ হলো সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং মানুষ ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক হলো একটি অন্যটিকে ছাড়া অর্থহীন, একে অন্যের সাপেক্ষ। সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের মধ্যে মানবতার প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে ও মানবতার স্বাদ গ্রহণ করা যায়। তিনি নির্বিচারে কিছু গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল বাস্তবানুগ এবং ধর্মচিন্তা তাঁর জগৎ ও জীবনধারার বাইরে কোনো অধ্যাত্ম সাধনা করা নয়। তাঁর ধর্মসাধনার মূল বিষয় ছিল মানবকল্যাণ। তিনি জগৎ, ধর্ম, ঈশ্বর, মানবতা ইত্যাদিকে বিচার করেছেন যুক্তিপ্রবণ মনন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোকে এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। সুতরাং, বিশ্বকার্যের মূল শক্তিতে তাঁর বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্বাস ছিল এবং ধর্মচিন্তার মূলে ছিল মানবকল্যাণ। এই যুক্তিবাদী মানবপ্রেমিক মানুষের স্থায়ী কল্যাণ করতে চেয়েছেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের মতো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ইহজাগতিক ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন দার্শনিক ও লেখক। বাস্তববাদী ও মানবপ্রেমিক হিসেবে মানুষের যথার্থ কল্যাণসাধনের আদর্শই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন; এবং হিন্দু ধর্ম ও দর্শনেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। কিন্তু স্মৃতি, বেদান্ত, ন্যায়শাস্ত্র ও হিন্দু দর্শনে সুপণ্ডিত হয়েও তিনি হিন্দুর ষড়দর্শনকে গ্রহণ করেননি; কারণ তাঁর মতে এ দর্শন অতিশয় তত্ত্বঘেঁষা, জীবনের বাস্তব প্রয়োজনাদির ব্যাপারে বড়ই উদাসীন (আমিনুল, ২০০২, পৃপৃ. ১২২-১২৩)। বিদ্যাসাগরও পাশ্চাত্য দর্শন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। সুস্থসমাজ ও ব্যবহারিক জীবন গড়ে তোলার জন্য তিনি পাশ্চাত্য মানবতাবাদের পূজারি ছিলেন। অগাস্ট কোঁত এবং জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ দার্শনিক তাঁর আদর্শ ছিলেন। কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদ তাঁর চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল। (হাই ও আহসান, ১৯৭৪, পৃপৃ. ৫৩-৫৪) । তিনি হিতবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের সংমিশ্রণে তিনি সার্বিক মানবকল্যাণের লক্ষ্যে তৎকালীন ঘুণে ধরা সমাজকে পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। তিনি পরলোকের কল্যাণকে দূরে সরিয়ে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার অধিকারী ছিলেন।

বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য রেনেসাঁকে অনুসরণ করেই তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন প্রথা, ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মীয় প্রভাব প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করে মানুষের আত্মশক্তির জয়গান করে ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন উন্মেষের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি হিন্দু বিধবাদের পুনঃবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের মতো বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার করেন। তাছাড়া, শিক্ষা-সংস্কারের জন্য অশিক্ষা ও কুশিক্ষার পরিবর্তে সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ও শিক্ষা দর্শন প্রচার করেন। এভাবে বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল মানুষ ও মানবতাবোধ। শুধু সংস্কারের জন্যই নয়, বরং মানুষের সার্বিক কল্যাণেই তাঁর সমগ্র সমাজ-সংস্কার নিবেদিত ছিল।

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) একজন মানবতাবাদী দার্শনিক ও জীবনবাদী সংস্কারক। তাঁর মানবতাবাদী ও জীবনমুখী কর্মের মধ্যে সকল জাতি ও ধর্মের লোকদের নিয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান রিফর্মস অ্যাসোসিয়েশন' পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে একত্রে বসবাস ও মিলিত উপার্জনে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত আশ্রম' দেশব্যাপী প্রচারের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠিত 'প্রচারক সভা' এবং শিক্ষাবিস্তার ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য কলকাতায় 'আলবার্ট হল' ও 'আলবার্ট ইনস্টিটিউট' উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রচেষ্টাতেই অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমন্দির নির্মিত হয়। তাঁর ধর্মসমীক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হলো '*নববিধান*'। এর মাধ্যমেই তিনি সমন্বয়ী ধর্ম প্রচার করেছেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে এক উদার আধ্যাত্মিক ও সর্বজনীন ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, নববিধানের লক্ষ্যই ছিল উদার ও সার্বভৌম দৃষ্টি সৃষ্টি করা (মতিউর, ২০১২, পৃপৃ. ২৫৪-২৫৫) ।

কেশবচন্দ্র বলেন, "ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম এতদিন কেবল হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম ছিলেন-এখন তিনি সমগ্র জগতের ব্রহ্ম হইলেন। ... এতদিন গগণে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান, হিন্দুধর্ম্মের নিশানের পরিবর্তে এখন গগণে সার্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন। বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র মিলিত হইল" (কেশবচন্দ্র, ১৭৯২, পৃ. ৩)। সমাজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে তাঁর নির্মিত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমন্দির একটি জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয়। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "এই দেখিয়াই নববিধান নামে আখ্যাত করিলাম নবব্রাহ্মধর্মকে। অন্যে আংশিকভাবে রাখিতে

পারেন, নববিধানে তাহা কখনই হতে পারে না। আমার জীবনে যত দেখিয়াছি। এক একটি লইলে অপরাধ থাকে, তখন এই নুতন নামে ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপস্থিত করা আবশ্যক (কেশবচন্দ্র, ১৮৮৩, পৃ. ১১৮)। সুতরাং, তাঁর দর্শনের লক্ষ্য ছিল '*নববিধানের*' মাধ্যমে জাগতিক সৌহার্দ্য, সর্বাত্মক ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে জাতি-ভেদের পার্থক্যের ঊর্ধ্বে রাখা। মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে এর মধ্যেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা।

কেশবচন্দ্রের সমাজ-সংস্কার ও মানবতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ধর্মকে আলিঙ্গন করে যাবতীয় ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে সমাজকে প্রগতির পথে ধাবমান রাখা। তাঁর ধর্মমতের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সমগ্র মানবকল্যাণের পথ প্রশস্ত করা। তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধর্মনির্ভর বাঙালি জাতির জন্য তথা সমগ্র বিশ্বে সর্বজনীন মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মীয় ঐক্যকে সর্বাগ্রে রাখতে হবে। তিনি যে এক বড় মাপের মানবতাবাদী ছিলেন তাঁর একটি দৃষ্টান্ত হলো '*নববিধান*' প্রণয়ন করা। তিনি তাঁর সমন্বিত ধর্মমত সংবলিত '*নববিধানে*' পৃথিবীর সব ধর্ম, সব গ্রন্থ ও সব অবতারের স্থান করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে এক সারিতে একতাবদ্ধ করতে চেয়েছেন। যেহেতু মানবতাবাদের প্রতিবন্ধকতা হলো সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি তাই বাঙালির রেনেসাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সকল প্রকার ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি, ধর্মীয় কুসংস্কার পরিহার করে মানবতাপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা। কেশবচন্দ্র সেনও মানুষকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সৌহার্দ্য স্থাপন করার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

যুগের প্রয়োজনে বিভিন্ন কালে আবির্ভূত হয়েছে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারা। আধুনিক যুগের বাংলায় এমন একজন দার্শনিক রয়েছেন, যিনি সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে মানবতার দিকটিকে মুখ্য হিসেবে প্রচার করেছেন। সার্বিক মানবতাবাদের পক্ষে এমন জোরালো গুরুত্ব দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬)। ধর্মকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে ধর্মের মধ্যে পরম ঐক্যের সন্ধান করেছেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'যত্র জীব তত্র শিব' এর মধ্যে দিয়ে মানবতা ফুটে ওঠে। এর মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের বসবাস। জীবের সেবার মাধমেই ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করা যায়। তাই জীব সেবাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন, জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা, স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে সব জীবই সেবা ও প্রেমের পাত্র। রামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জীবসেবার এই পরম ধর্মকেই পরবর্তীকালে প্রচার করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানবপ্রেমের দর্শনের ভিত্তিতে বিবেকানন্দ তাঁর মানবতাবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রতিটি জীবই স্রষ্টার সৃষ্টি, আর সে কারণে প্রতিটি জীবই সেবা ও প্রেমের পাত্র। মানুষে-মানুষে কোনো পার্থক্য করা উচিত নয়। রামকৃষ্ণ বলেন, "জাতিভেদ একটা উপায়ে উঠে যেতে পারে। সেই উপায়টা হচ্ছে ভক্তি। ভক্তের জাত নেই। চণ্ডালও যদি ভক্তিলাভ করে সে আর চণ্ডাল থাকে না। আর একটি উপায় হচ্ছে, নিজেকে বোঝার জ্ঞান লাভ" (রমেশচন্দ্র, ১৯৭১, পৃ. ২০৯)। তাই মানবপ্রেমই জীবনের পরম ধর্ম। শ্রীচৈতন্যদবও এমন মানবপ্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। তবে তাঁর প্রচারিত প্রেম ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারিত প্রেম এক নয়। রামকৃষ্ণের প্রচারিত প্রেম শ্রীচৈতন্যদেবের অতীন্দ্রিয় প্রেম নয়, এ প্রেম যথার্থ মানবপ্রেম যা মানুষের কাছে স্বয়ং ঈশ্বরকে খুঁজে ফিরেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ এ প্রেমধর্মের আলোকেই এক সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবাদের দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বজনীন মৈত্রী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং এর যথার্থ প্রতিফলন দেখতে পাই মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতির মধ্যে।

রামকৃষ্ণ উদার ও কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন। তাঁর দর্শনে ধর্মীয় গোঁড়ামি কিংবা সাম্প্রদায়িকতার কোনো প্রশ্রয় নেই। তিনি বিশ্বজনীন মানবতাবাদী ধর্মের জয়গান করেছেন। তাঁর অমর উদার বাণী 'যত মত তত পথ' সব ধর্মের আধ্যাত্মিক পথকে সঠিক বলে প্রচার করেছে, যা বিভিন্ন ধর্মে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি সকল ধর্মের পক্ষেই কথা বলেছেন। বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধনের দর্শনই তাঁর দর্শন। তাই তাঁর মতে সকলকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে মানবপ্রেমে, আর গড়ে তুলতে হবে শান্তির পৃথিবী।

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে মানবতাবাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা পরিচিতি লাভ করে। নিরীশ্বরবাদী মানবতাবাদের সমর্থন করেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর। আর আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী দার্শনিকেরা মানুষকে মুখ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এদের মধ্যে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দার্শনিক অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দ একজন মানবতাবাদী দার্শনিক এবং তাঁর দর্শন চিন্তার মূলে রয়েছে মানুষ। মানুষের যাবতীয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মানবতাবাদের মূলমন্ত্র ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি 'যত্র জীব তত্র শিব'। শ্রীরামকৃষ্ণ শিবজ্ঞানে জীব সেবার মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজেন। তিনি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর মতে, জীবসেবার মধ্যেই জাতিভেদ বিলীন হয়ে যায় এবং গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলে জীবসেবার মধ্যে দিয়ে তিনি

ঈশ্বরকে লাভ করতে চেয়েছেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন স্রষ্টা এক। তাঁর সৃষ্টি সকল মানুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। বিশ্বভ্রাতৃত্বের এ চেতনাই সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে মানবকল্যাণে পরিচালিত করবে (শামস-উল, ১৯৯৯, পৃ. ৪২৪) । তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ ও বিশ্বমানব প্রেমিক। বিশ্বমানবতাবাদ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তাই তিনি বলেছেন, আমার স্বদেশকে ভালবাসবো; এও মনে রাখবো যে, এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্যান্য দেশের মানুষের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। কারণ সব মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি (আমিনুল, ২০০২, পৃ. ১৬০) ।

বিবেকানন্দের জীবনদর্শন ও মননসাধনার মূল লক্ষ্যই ছিল মানুষ। তাঁর মানবসেবার প্রধান উৎস ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী। তাছাড়া উপনিষদের বিভিন্ন শ্লোকে বিবেকানন্দ তাঁর মানবপ্রেমের সন্ধান পান। উপনিষদের উপর আস্থা থেকেই তিনি তাঁর বৈদান্তিক মানবতাবাদ গড়ে তুলেন। তিনি অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়ান। তাঁর মতে, এটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম, এটিই শ্রেষ্ঠ দান এবং এটিই শ্রেষ্ঠ মানবসেবা। এ কারণেই তিনি বলেন: "আর নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান, একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি এবং হাজার যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী নারায়ণ, তাপী নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র-নারায়ণ! এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য" (বিবেকানন্দ, বা. ১৩৮৪, পৃ. ৪১২)। তাঁর মানবসাধনার একদিকে মানবিকতা, অন্যদিকে সর্বজনীনতা। তাঁর মানবপ্রেম সংগ্রামী মানুষদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর মানবপ্রেমের আরো সন্ধান মিলে তাঁর রচিত 'সখার প্রতি' কবিতায়। তাঁর কবিতার কয়েকটি চরণ হলো এমন:

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ করে সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।
(বিবেকানন্দ, বা. ১৩৮৩, পৃ. ২৬৯)

উনিশ শতকে যেসব বাঙালি চিন্তাবিদ পাশ্চাত্য দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) অন্যতম। পাশ্চাত্যের উপযোগবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীলতাকে

প্রভাবিত করেছে বিশেষ করে বেন্থামের উপযোগবাদ তাঁকে বেশি প্রভাবিত করেছে । বঙ্কিমচন্দ্র হিতবাদের প্রবর্তক বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২)-কে শ্রদ্ধা করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, বেন্থাম হিতবাদ-দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন (বঙ্কিমচন্দ্র, বা. ১৩৯২, পৃ. ৫৪) । বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম ও দর্শনের মূল্য লক্ষ্যই হলো ব্যক্তির সুখসাধন করা,আর কর্ম দিয়ে ব্যক্তি তাঁর সুখ অর্জন করতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে সমষ্টিগত সুখকেই সমর্থন করেছেন। তিনি মানবকল্যাণ তথা সামাজিক সর্বাধিক উন্নতির কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যিকার অর্থেই একজন মানবতাবাদী দার্শনিক ছিলেন এবং ব্রিটিশ উপযোগবাদী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিতবাদী দর্শন প্রচার করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মানবতাবাদের মূলে ছিল সাম্যচিন্তা। তিনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন এদেশে মানুষে-মানুষে কৃত্রিম বৈষম্য বিদ্যমান, আর যেখানে কৃত্রিম বৈষম্য বিদ্যমান, সেখানে আইনের মাধ্যমেও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা জরুরি। তিনি তাঁর *সাম্য* গ্রন্থে পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ ও অসাম্য দেখানো হয়ে থাকে তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর সাম্যনীতির মূলকথাই হচ্ছে মানুষে-মানুষে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা (মতিউর, ২০১২, পৃপৃ. ৩৯৬-৩৯৭)। তিনি সমাজ জীবনের কুফল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তবুও সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বলেন:

> সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মানুষের যতগুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষক এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়াই ওগুস্ত কোমত 'মানবদেবী'র পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশি বলিবার প্রয়োজন নাই (বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯২, পৃপৃ. ৬১৯-৬২০) ।

আধুনিক মানবতাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) অন্যতম। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দর্শনেই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক তবুও মানবতাকে তিনি ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "কেন পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিব, এ কথার চরম উত্তর বিজ্ঞানবিদ্যার নিকট পাওয়া যায় না। পরার্থপরতার

অর্থাৎ পরার্থে স্বার্থত্যাগের প্রেরণার মূল সৃষ্টিতত্ত্বের বীজের মধ্যে নিহিত আছে" (রামেন্দ্রসুন্দর, বা. ১৩২০, পৃ. ৩০)। তাঁর *কর্ম্মকথা* গ্রন্থে 'মুক্তির পথ' প্রবন্ধে বলেছেন, "দুখের সহিত সুখ আইসে, অবিমিশ্র দুঃখ জগতে নাই, এ কথাটা যেমন সত্য, সুখের সহিত দুঃখ আইসে, অবিমিশ্র সুখ জগতে নাই, এ কথাটিও তেমনি সত্য। ইহাতে সন্দেহ করিলে সত্যের অপলাপ হয়" (রামেন্দ্রসুন্দর, বা. ১৩২০, পৃ. ৬)। দুঃখকে জয় করার মধ্য দিয়েই মুক্তি আসবে বলে তিনি মনে করেন।

বাঙালি জীবনবাদী এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় অক্ষয় কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের দর্শনে। তেমন প্রত্যক্ষবাদী ধারার সমর্থক ছিলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাঁর দর্শনচিন্তায় অলৌকিকতা বা পারলৌকিতার স্থান নেই। ভগবদগীতার আলোকে তিনি মানবতার কল্যাণ সাধনের উপায় বলেছেন। ত্রিবেদীর মতে, "স্বার্থের অভিমুখে, প্রবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা তার নাম অধর্ম, আর পরার্থের অভিমুখে, নিবৃত্তির অভিমুখে ধাবমান প্রচেষ্টাকে বলে ধর্ম" (রামেন্দ্রসুন্দর, বা. ১৩২০, পৃপৃ. ৩৩-৩৪)। তাঁর চিন্তায় বিজ্ঞান ও ধর্মের ক্ষেত্রে মানবকল্যাণের সুরই প্রতিফলিত হয়েছে।

জাতি হিসেবে বাঙালি সংকর বলে প্রাচীন যুগের বাংলা থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন দর্শন ও চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এসব অঞ্চলের মানুষ। বিভিন্ন গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের বাংলা বিকশিত হয়েছে। যুগের প্রেক্ষাপটে বাংলায় পরিচিতি লাভ করে অস্তিত্ববাদ, প্রয়োগবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, মার্কসবাদ, বিশ্লেষণী দর্শন ও মানবতাবাদের মতো বিভিন্ন মতবাদ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাঙালি দার্শনিকের মানবতাবাদের পর্যালোচনা

আধুনিক যুগের বাঙালি দার্শনিকের চিন্তা চেতনায় মানব, মানবতা ও সমাজের যে চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তা পুরো গোষ্ঠীর অবদান। বাঙালি দার্শনিকেরা মানুষ, মানুষের স্বরূপ নিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর সাথে সংযুক্ত ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বোপরি মানবতাবাদ ও মানবপ্রেম নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং মানুষকে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেছেন। রামমোহন তাঁর ধর্মসাধনার মধ্যে দিয়ে মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য যে ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রেম তার শাশ্বত বাণী প্রচার করেছেন এবং ধর্মের সংস্কারের মাধ্যমে বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই বাঙালির নবজাগরণে তাঁর

অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। রামমোহন মানবতাবাদের যে উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন তা আরও সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ব্রাহ্মসমাজে সাম্যসাধনার এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। তাঁর সময়ে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ শিক্ষিত জনমনে বেশ প্রভাব ফেলেছিল। দেবেন্দ্রনাথও ধর্মসাধনায় যুক্তি ও ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সাথে একাত্মতা পোষণ করে বেদ-বেদান্ত বর্জন করে সাধারণ মানুষের আত্মপ্রত্যয়ের উপর ব্রাহ্মধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কেশবচন্দ্র সেন জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করে ব্রাহ্মধর্ম সর্বজনীন করার চেষ্টা করেন। নারী-পুরুষের অধিকারগত সাম্য প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র সব ধরনের শোষণক্রিয়ার সমালোচনা করে শ্রেণিগত বৈষম্য দূর করে মানবসমাজে পরিপূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁর অন্তরে গভীর মানবপ্রীতি ছিল, তাই তাঁর লেখনির সর্বত্রই সাম্যনীতির জয়গান দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় স্বামী বিবেকানন্দ বৈদান্তিক অদ্বৈতবোধে উপনীত হন, যাঁর ফলে তাঁর মানবপ্রেম বৈশ্বিক একাত্মবোধের রূপ পরিগ্রহ করে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যাবতীয় অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মানুষ ও সমাজকে মুক্ত করে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন।

মানবতাবাদী এসব দার্শনিকেরা মানুষকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত ও মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মানুষের কর্মক্ষমতা,দক্ষতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বর্তমান বিশ্ব যান্ত্রিক সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেছে ঠিকই, কিন্তু মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ কমেনি। মানুষ মানুষকে নানাভাবে নিপীড়ন, শোষণ ও অত্যাচার করছে– এটাই বর্তমান সমাজের প্রতিচ্ছবি। তাছাড়া বর্ণবৈষম্যের মতো সংকীর্ণ মনমানসিকতা মানুষের মৌলিক অধিকার, স্বাতন্ত্র্যবোধ সর্বোপরি মানবিক মর্যাদাকে কেড়ে নিয়ে মানুষকে অস্থির ও হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। মানবিক মূল্যবোধের এমন অবক্ষয়ের জন্য বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আজ ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই সংঘাতময় বিশ্বে আধুনিক যুগের এসব বাঙালি দার্শনিকের মানবতাবাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাহলেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপসংহার

আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণায় বাঙালির দর্শনচিন্তায় মানবতাবাদের যে চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তা যে বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর একক অবদান নয় এটা স্পষ্ট। বাঙালিরা যুগের

ধারাবাহিকতায় স্বদেশের সুমহান ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি মন্থন করে মানবতাবাদী ধারণা গঠন করেছেন। আধুনিক যুগের বাঙালি দার্শনিকেরা ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র, নীতি-নৈতিকতা ও সর্বোপরি মানবতাবাদ নিয়ে আলোচনা করে মানুষকে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। মানবভাবনা, মুক্তবুদ্ধি, মনুষ্যত্ব, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এই দৃষ্টিভঙ্গিই আধুনিক যুগের বাঙালি মনীষার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আধুনিক যুগের অনেক বাঙালি দার্শনিকেরা যৌক্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং তাঁদের চিন্তাধারায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে বলেই তাঁরা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া বাঙালি দার্শনিকেরা আবেগের সাথে বিবেকের এবং বিশ্বাসের সাথে যুক্তির মিলন ঘটিয়ে এই অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে সকল মানুষকে এক ও অভিন্ন মানবতাবাদী পতাকাতলে একতাবদ্ধ করে আদর্শ জীবনদর্শন গড়তে চেয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, শোষণ, বঞ্চনা ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখি, সেক্ষেত্রে এসব মানবতাবাদী দার্শনিকের চিন্তা-চেতনা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই বাঙালির দর্শনচিন্তায় মানুষ, সমাজ তথা মানবতার স্বরূপ সন্ধান তত্ত্বালোচনার সীমা অতিক্রম করে বাস্তব জীবনমুখী হয়ে উঠেছে ।

সহায়কপঞ্জি

অক্ষয়কুমার, দত্ত। (১৮৫১)। *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার*, প্রথম ভাগ। কলিকাতা।

আমিনুল ইসলাম। (১৯৯৬)। *পাশ্চাত্য দর্শন: প্রাচীন ও মধ্যযুগ*। শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

আমিনুল ইসলাম। (২০০২)। *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

কেশবচন্দ্র সেন। (১৭৯২)। *সেবকের নিবেদন*, তৃতীয় খণ্ড। কলিকাতা।

কেশবচন্দ্র সেন। (১৮৮৩)। *জীবনবেদ*। নববিধান পাবলিকেশন্স, কলিকাতা।

তেসলিম চৌধুরী। (২০১১)। *ভারতের ইতিহাস- আধুনিক যুগ (১৭০৭-১৯৬৪)*। মিত্র, কলকাতা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৯৬২)। *আত্মজীবনী*, শতীকাচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলিকাতা।

নবেন্দু সেন। (১৯৭১)। *গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, কলিকাতা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (১৩৯২)। 'বঙ্কিম রচনাবলী', [সম্পা. যোগেশচন্দ্র বাগল], দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা।

বিবেকানন্দ, স্বামী। (বা. ১৩৮৪)। *বাণী ও রচনা*, সপ্তম খণ্ড। কলিকাতা।

বিবেকানন্দ, স্বামী। (বা. ১৩৮৩)। *বাণী ও রচনা*, ষষ্ঠ খণ্ড। কলিকাতা।

মণি বাগচি। (১৯৬০)। *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ*। জিজ্ঞাস, কলিকাতা।

মতিউর, এম রহমান। (২০১২)। *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ*। অবসর প্রকাশনা, ঢাকা।

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। (বা. ১৪০০)। 'রামমোহন': ব্যক্তিত্বের মূলসূত্র'। *দর্শন ও দার্শনিক* [সম্পা. সুনিলকুমার দাস], প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা; বৈশাখ-আশ্বিন।

শামস-উল হক, মুহাম্মদ। (১৯৯৯)। 'বিবেকানন্দ ও মানবিক মূল্যবোধ'। *বাংলাদেশে দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ২য় খণ্ড [সম্পা. শরীফ হারুন], ঢাকা ।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। (১৯৯০)। *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, ১ম খণ্ড। জি.এ.ই পাবলিশার্স, কলকাতা।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। (১৯৯১)। *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা*, ২য় খণ্ড। জি. এ. ই পাবলিশার্স, কলকাতা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার। (১৯৭১)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড। জেনারেল, কলকাতা।

হাই, মুহাম্মদ আবদুল ও আহ্সান, সৈয়দ আলী । (১৯৭৪) । *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), ৪র্থ সংস্করণ, চট্টগ্রাম ।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। (বা. ১৩২০)। *কর্ম্মকথা, জীবন ও ধর্ম*। নিবেদন, কলিকাতা।

Basu, P.S. (1940). *Life and works of Brahmananda Keshub Chandra Sen*, Navavidhan Publication, Calcutta.

Collet, S.D. (1962). *The Life and Letters of Rajah Rammohun Roy*, London.

Seal, B.N. (1912). *Rajah Rammohun Roy: The Universal Man*, Calcutta.

Stace, W.T. (1972). *A Critical History of Greek Philosophy*, Macmillan and Co, St. Martins Street, London.

Thilly, Frank. (1914). *A History of Philosophy*, Henry Holt and Co, New York.